ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সম্পর্কিত মতবাদ (Relation between individual and society)

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে প্রধানতঃ তিনটি মতবাদ সমাজ দর্শন তথা সমাজবিজ্ঞানে লক্ষ্য করা যায়। তবে এই মতবাদগুলি আলোচনার পূর্বে আমাদের জানতে হবে 'ব্যক্তি' ও 'সমাজ' বলতে ঠিক বোঝায় এবং মানুষের ঠিক কোন্ প্রয়োজনে সমাজের উৎপত্তি। মানুষের আছে একাধারে বোধশক্তি, অন্যধারে ব্যক্তিত্ববোধ। মানুষের দৈহিক গঠন, তার অনুরাগ, আগ্রহ, মনোভাব, আচরণ-প্রবণতা ও বৌদ্ধিক সামর্থ্যের মধ্যে বিশেষ ধরনের সংহতি বা ঐক্যই হল ব্যক্তিত্ব। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (Woodworth) এর মতে, 'ব্যক্তিত্ব কেবল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের যোগফল নয়, অতিরিক্ত আরও কিছু এবং ঐ 'অতিরিক্ত কিছু' হল 'বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বা ঐক্য' অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হল একটি জটিল সমগ্রতা যেখানে উপাদানগুলি এক ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিত্ব এক বিমূর্ত প্রত্যয় বা ধারণা।

আর এই প্রকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধকেই নিয়ে সমাজ। সমাজ হল বিমূর্ত সামাজিক সম্বন্ধ। সমাজ হল সামাজিক সম্বন্ধের জটাজাল যা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজ হল এমন একটি জটিল বুনট বা জাল যার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গীর সাথে আন্তর সম্বন্ধে যুক্ত থাকে।

সমাজের মধ্যে বসবাস করেই ব্যক্তির 'ব্যক্তিত্ব' নামক লক্ষণের প্রকাশ পায়, আর এ প্রকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির নানাবিধ সম্পর্ককে নিয়েই গড়ে ওঠে সমাজ। স্পষ্টতই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। মানুষ স্বভাববশে সমাজে বাস করে, নিসঙ্গ জীবন তার স্বভাব বিরোধী। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে 'যে ব্যক্তি সমাজ-জীবন যাপনে সমর্থ নয়, অথবা নিজে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, তিনি হয় দেবতা, নয় পশু'।

কিন্তু এখানে স্বাভাবিক কারণে যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হল - কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ ? ব্যক্তি মুখ্য অথবা সমাজ মুখ্য ? কোন্‌টি আগে, কোনটি পরে। ব্যক্তি আগে না সমাজ আগে। বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তি ও সমাজের নিবিড় সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এমন প্রশ্ন বিভ্রান্তিকর এবং যার কোন সহজ সমাধান সম্ভব নয়। গাছ আগে না বীজ আগে - এর যেমন কোন সমাধান নেই, একইভাবে সমাজ আগে না ব্যক্তি আগে এই প্রশ্নরও উত্তর খুঁজতে যাওয়া বাতুলতামাত্র। তবুও পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকদের ইতিহাসে এ সম্পর্কে এমন কতকগুলি মতবাদ পাওয়া যায় যে মতবাদগুলি কিন্তু পরস্পর বিরোধী ও ভ্রান্ত মতবাদ। এগুলি হল ১) ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ, ২) আঙ্গিক মতবাদ ও ৩) ভাববাদ বা গোষ্ঠী চেতনাবাদ

১) ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ঃ সামাজিক-চুক্তি মতবাদ (Individualistic Theory: Social Contract Theory) ঃ

এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তি প্রধান, সমাজ অপ্রধান। ব্যক্তির সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তার স্বকীয়তা, তার স্বাতন্ত্র্যে, তার স্বাধীনতায়। সমাজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের, ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। মতাবাদটি অতি প্রাচীন। প্রায় ৬০০ খীষ্ট্রপূর্বাব্দে চীন দেশের শাও-ধর্মমতে এই মতবাদটির সমর্থনে বলা হয়, 'সমাজের সদস্যরূপে ব্যক্তি তার জীবনকে উপভোগ করতে পারে না, ব্যক্তির পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিহিত থাকে সমাজ-বহির্ভূত জীবনে, যেখানে ব্যক্তি হয় স্বনিয়ন্ত্রিত'। সমাজ ও সমাজের বিধিনিষেধ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী।

এই মতবাদ প্রাচীন চীন দেশকে, এমনকি কন্‌ফুসিয়াসের(Confucius) সময়ের চীন দেশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এর প্রায় দুই শতাব্দীর পরে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও(Plato) তাঁর রিপাবলিক(Republic) গ্রন্থে গ্লাউকন্ (Glaucon) ও এ্যাডাইমেন্টাস(Adeimantus)-এর কথোপকথনের মাধ্যমে আনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, প্লেটো নিজে কিন্তু এই মতবাদকে সমর্থন করেন নি। (প্লেটোর মতবাদ ভাববাদ সম্মত মতবাদ)। গ্লাউকন্ ও এ্যাডাইমেন্টাসের অভিমত অনুসারে ব্যক্তিমাত্রই স্বভাববশে স্বার্থপর ও নিজ স্বার্থসাধনের জন্য এই অরাজক অবস্থার অবসানের জন্য পরস্পর চুক্তিবদ্ধ(Contract) হয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের গঠন করে। অর্থাৎ স্বভাবত স্বাতন্ত্র্যধর্মী ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে। সমাজ হল এক কৃত্রিম সংগঠন।

দীর্ঘকাল পরে এই মতবাদটি ইংলন্ড ও ফ্রান্সে পুনরায় প্রচারিত হয়। শপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স(Thomas Hobbes) এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ দার্শনিক লক্‌ (John Locke) ও ফরাসী দার্শনিক রুশো (J. J. Rousseau) কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন আকারে মতবাদটি পুনঃপ্রচার করেন। এঁদের প্রত্যেকের মতে এমন একটা সময় ছিল মানুষ থাকলেও মানুষের সমাজ ছিল না। এমন এক প্রাক্‌ সমাজ অবস্থায় কোন এক পর্যায়ে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করে। আমরা এখন সামাজিক-চুক্তি বিষয়ক এঁদের মতবাদগুলি ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করতে পারি।

ক) হব্‌স-এর মতবাদ (১৫৮৮ - ১৬৭৯) ঃ

সপ্তদশ শতকে প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স তাঁর বিখ্যাত 'দ্য লেভিয়াথাঁ (The Leviathan) গ্রন্থে প্রাক্ সমাজ অবস্থার - হব্‌স যাকে বলেছেন 'The State of Nature' - যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা অতি ভয়াবহ। এই অবস্থায় মানুষেরা স্বভাবই ছিল লোভী, স্বার্থপর, অপরের বিরুদ্ধতা করা, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা, অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করা, অপরকে হত্যা করা প্রভৃতি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে যেন এক একটা বন্য, বর্বর, হিংস্র নেকড়ে বাঘ। এমন এক সমাজ-পূর্ব অবস্থায় হব্‌সের ভাষায় মনুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, ঘৃণ্য, পশুতুল্য এবং সংক্ষিপ্ত।

এমন অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তৎকালীন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষ নিজ নিজ স্বর্থরক্ষার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করে। চুক্তি অনুসারে প্রত্যেকে নিজ নিজ যুদ্ধ-প্রবৃত্তিকে দমন করে, অবাধ স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে, কোন এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বা কয়েকজন ব্যক্তিকে নিজ নিজ ক্ষমতা অর্পণ করে। আর এভাবেই প্রাক্ সমাজ অবস্থার কোন এক পর্যায়ে শাসক বা রাজা অথবা শাসকমণ্ডলীর আবির্ভাবের ফলে সমাজ বা রাষ্ট্রের পত্তন হয়। দ্য লেভিয়াথাঁ গ্রন্থে হব্স চুক্তির বয়ানটিকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করেছেন।

‘আমি এতদ্বারা (অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে) এই ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিবর্গকে আমার স্বশাসনের ক্ষমতা সমর্পণ করছি এই শর্তে যে তুমিও স্বশাসিত হওয়ার ক্ষমতা এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সমর্পণ করে তার বা তাদের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম, আমারই মতন, অনুমোদন করবে’।

তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, জনসাধারণ চুক্তটিতে অংশগ্রহণ করলেও নির্বাচিত ব্যক্তি বা শাসকবর্গ চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে নি। এরফলে, শাসক বা রাজার ওপর জনসাধারণের কোন কর্তৃত্ব থাকে না এবং শাসক ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনস্বার্থবিরোধী কিছু করলে জনসাধারণের বিরোধিতার কোন অবকাশ থাকে না। এর ফলে পরিণামে অর্থাৎ পরবর্তীকালে মানুষনাত্রই শাসকের আদেশ পালন ও সমাজের বা রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকে। স্পষ্টতই, ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থক হব্‌স অবশেষে স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেন।

খ) লকের মতবাদ (১৬৩২ - ১৭০৪) ঃ

ইংরেজ দার্শনিক লকও হব্‌সের মত মনে করেন যে প্রাক-সমাজ অবস্থার কোনো এক স্তরে চুক্তির ফলেই কৃত্রিমভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তবে প্রাক্ সমাজ অবস্থার বা প্রাকৃতিক অবস্থার (State of Nature) লক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হব্‌সের বর্ণনা থেকে ভিন্ন। লকের মতে প্রাক্-সমাজ প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ছিল না, ছিল সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য। প্রাক্-সমাজের এ প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থাকে লক সুবর্ণযুগরূপে (Golden age) বর্ণনা করেছেন। সমাজ-পূর্ব জীবনে সমাজের কোনরূপ অনুশাসন বা বিধিনিষেধ না থাকায় মানুষের জীবনে ছিল অবাধ স্বাধীনতা ও অপরিমিত স্বাচ্ছন্দ্য। বন থেকে সুখাদ্য ফলমূল ও পশুমাংস সংগ্রহ করে এবং স্বচ্ছতোয়া নদীর নির্মল জল পান করে তার জীবনে ছিল স্বর্গীয় সুখ ও শান্তি। এই সময়ে মানুষের জীবনে একমাত্র পালনীয় ছিল প্রকৃতির নিয়ম যা, লকের মতে, পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের নিয়ম (Laws of God)। ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাক-সমাজ অবস্থায়, মানুষের জীবনে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সঠিক তাৎপর্য কি এবং এই সব নিয়ম মানুষ মাত্রেই অনুসরণ করে কিনা - এ জাতীয় প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মানুষ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ প্রকার সমাস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই তৎকালীন মানুষ মিলিত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা সমাজ বা রাষ্ট্ররূপ সংগঠন সৃষ্টি করে। এই সংগঠন বা সংস্থার প্রধান কর্তব্য হল, সাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। এই চুক্তিতে(প্রথম চুক্তি) প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বাধীন ক্ষমতার কিছু অংশ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অর্পণ না করে সমবেত ব্যক্তিবর্গকে অর্পন করে এবং ওই সমবেত ব্যক্তিবর্গের সমর্থনই হল সমাজ বা রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তি। এই সমবেত ব্যক্তিবর্গ আবার দ্বিতীয় এক চুক্তির দ্বারা রাজা নির্বাচন করে(রাজা আবার তাঁর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করেন)। প্রথম চুক্তির ফলে সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং দ্বিতীয় চুক্তির ফলে রাজপদ সৃষ্টি হওয়ায় রাজকার্য পরিচালনার জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ প্রকার চুক্তির ফলে যে সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তার ক্ষমতা চূড়ান্ত বা সার্বভৌম হতে পারে না, কারণ চুক্তির ফলে মানুষ তার কিছু ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অর্পণ করে নি। শর্ত অনুসারে মানুষ তার কিছু ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সমাজ বা রাষ্ট্রকে অর্পণ করেছে এই শর্তে যে, সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষিত হবে।। নির্বাচিত রাজা বা সরকার যদি মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারে, তাহলে জনসাধারণের সেই অযোগ্য রাজার পদচ্যুতি ও সরকারের পতন ঘটানোর অধিকার থাকে। কাজেই লকের মতে, চুক্তি-ভিত্তিক কোন সমাজ বা রাষ্ট্রক্ষমতা চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় নয়। জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাই হল রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তি। লক তাঁর চুক্তি-মতবাদের মাধ্যমে গণতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

গ) রুশোর মতবাদ (১৭১২ - ১৭৭৮) ঃ

ফরাসী দার্শনিক রুশোও লকের মতো বিশ্বাস করেন যে প্রাক-সমাজ প্রকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবনে ছিল নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি। অরণ্য পশুদের মতো প্রকৃতিক নির্মল পরিবেশে বনচর অসভ্য মানুষের ছিল প্রাকৃতিক মহত্ব, রুশোর ভাষায় 'the noble savage' । রুশোর মতে, যা প্রাকৃতিক তাই মহৎ ও সুন্দর, আর যা মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম তাই অপকৃষ্ট ও অসুন্দর। প্রাক সামাজিক বনচর মানুষের স্বাধীন মুক্ত ও শান্ত জীবনকে রুশো 'মর্ত্যভূমিতে স্বর্গরাজ্য'রূপে(heaven on earth) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এমন নিরুদ্বিগ্ন শান্ত জীবন দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হতে পারে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রাক সমাজ অবস্থায় প্রকৃতিদত্ত সমস্ত সম্পদেই ছিল সব মানুষের সমান অধিকার এবং সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না।

কিন্তু ক্রমশঃ জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিলাভের প্রবণতা দেখা দেয় এবং তারই পরিণাম স্বরূপ দেখা দেয় স্বার্থের সাথে স্বার্থের সংঘাত। এই স্বার্থ সংঘাতের দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের পত্তন করে। এই প্রকারে কৃত্রিম সমাজ গঠনের ফলে রুশোর মতে, বনচর স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ তার স্বর্গরাজ্য থেকে বিচ্যুত হয়। রুশো তাঁর বিখ্যাত Contract Social গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বলেছেন, জন্মসূত্রে স্বাধীন মানুষ সমাজ বা রাষ্ট্রের বিধি-নিষেধে পরাধীন। সামাজিকভাবে সভ্য হওয়ার অর্থ হল দাসত্বকে স্বীকার করা। সামাজিকভাবে সভ্য মানুষ দাসত্বের নিগড়ে জন্মগ্রহণ করে, দাসত্বের মধ্যে বসবাস করে এবং দাসত্বের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। সমাজ বা রাষ্ট্রের অজস্র বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষের প্রতি রুশোর তাই আবেদন হল ‘Go back to Nature’। ‘বনচর মানুষ স্বাধীন, মুক্ত ও মহান জীবন লাভের জন্য আবার প্রাক-সামাজিক প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে চলো’।

এমন অভিমত প্রকাশ করেও, রুশো এক বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে সমাজজীবনের প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছেন। প্রাক সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মূল্যবান মনে করেও, রুশো বিপরীত মনোভাব পোষণ করে বলেছেন যে, সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থার সাহায্য ছাড়া মানুষ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে, তার স্বাতন্ত্র্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে পারে না। রুশো বলেন, শুধুমাত্র স্বার্থ সংঘাতের দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে নয়, সেই সাথে নিজের সৎগুণগুলিকে সাধ্যমত বিকশিত করার উদ্দেশ্যেও মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমাজের পত্তন করে।

এই চুক্তির ক্ষেত্রে কোন রাজা বা সরকারের প্রয়োজন হয় না, কারণ এই চুক্তি ব্যক্তির সাথে বিশেষ কোন গোষ্ঠীর চুক্তি নয়। এই চুক্তি হল সাধারণ ইচ্ছার (General Will) সাথে সকলের চুক্তি, যে চুক্তিতে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে, তার স্বাতন্ত্র্যকে বাতিল করা বা খর্ব করার পরিবর্তে তাদের সংরক্ষিত করা হয়। এই চুক্তিতে প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টিগত 'সাধারণ ইচ্ছা'র কাছে সমর্পণ করে। এই সম্মিলিত 'সাধারণ ইচ্ছা'ই সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিচালিকা-শক্তি।

তাহলে ‘সাধারণ ইচছা’ই হল রাষ্ট্রশক্তি যা সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। রুশোর এমন অভিমতের মধ্যে গণতন্ত্রের বীজ নিহিত আছে, কেননা সাধারণ মানুষের স্বাধীন মতামতের ওপর গণতন্ত্র নির্ভরশীল। তবে রুশোর অভিমতের মধ্যে একই সাথে গণতন্ত্রের বিপরীত একদলতন্ত্রের (Totalitarianism) ধারণাও নিহিত আছে। রুশো যে ‘সাধারণ ইচ্ছা’র উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে সব মানুষের মিলিত ইচ্ছা নয়, তা হল গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের অথবা প্রভাবশালী মুষ্টিমেয় মানুষের মিলিত ইচ্ছা অর্থাৎ বহুদল মানুষের পরিবর্তে একদল মানুষের ইচ্ছা। সমাজ বা রাষ্ট্রশক্তি এমন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হলে সেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনভাবে কর্মক্ষমতা রক্ষিত হতে পারে না।

রুশো ব্যক্তিস্বাধীনতাকে চরম মূল্যবানরূপে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অবশেষে তাকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং এখানেই রুশোর চুক্তি-মতবাদের আত্মবিরোধিতা (Self-contrdiction)। 'উদার গণতান্ত্রিক-মতবাদ এবং ভাববাদসম্মত একদলীয় শাসনতান্ত্রিক মতবাদ-এই দুটি অত্যন্ত বিরোধী মতবাদকে অর্ন্তভূক্ত করে রুশোর মতবাদটি আত্মবিরোধীদোষে দুষ্ট হয়েছে - এমন বললে অতিরিক্ত কিছু বলা হয় না কিন্তু।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা ঃ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ কোন যুক্তভিত্তিক মতবাদ নয়। কারণ -

১) চুক্তির ফলে যদি সমাজের উৎপত্তি হত তাহলে সমাজের উৎপত্তির পূর্বে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করতে হয়। হব্‌স, লক ও রুশো যে প্রাক-সমাজ অবস্থার উল্লেখ করেছেন তা নেহাৎই অবাস্তব। মানুষ তার প্রকৃতিবশে বা স্বভাববশে জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক জীব। জন্মলগ্নে মানব শিশু নিত্যন্ত অসহায়। তার পরিচর্যা ও লালন-পালনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে জন্মদাতাদের অর্থাৎ পিতামাতাদের অতিবাহিত করতে হয়। মাতাপিতা ও ভূমিষ্ট শিশুকে নিয়ে হল পরিবার। পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। কোন পরিবার আবার এককভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে একাধিক পরিবার স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর মিলিত হয়ে সম্প্রদায়গত জীবন-যাপন করে।

পরিবারের মতো সম্প্রদায়ও সমাজের অংশীভূত। কাজেই, মানুষের জীবনে প্রাক-সমাজ অবস্থা বলে কিছু থাকতে পারে না। মানুষ তার স্বভাববশে আদিমকাল থেকে এযাবৎ সামাজিক জীব। চুক্তি মতবাদের সমর্থকরা পরিবার ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রকে অভিন্ন কল্পনা করে তাদের মতবাদকে দুষ্ট করেছেন। রাষ্ট্র চুক্তিভিত্তিক এক কৃত্রিম সংগঠন হলেও পরিবার ও সম্প্রদায় অর্থাৎ সমাজ হল মানুষের জীবনে স্বাভাবিক। কাজেই মানতে হবে প্রাক্-সমাজ অবস্থা বলে মানুষের জীবনে কিছুই ছিল না।

২) সমাজ যে কোন এককালে চুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন হয়েছে, এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ নেই। সমাজের অর্ন্তগত বিভিন্ন সংগঠন বা সংস্থাগুলি (Associations) - যথা অর্থনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠনরূপে রাষ্ট্র ইত্যাদির পশ্চাতে চুক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা গেলেও সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এমন কোন তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায় না। মানুষ প্রথম থেকেই তার স্বাভাবিক প্রবণতাবশে সামাজিক। প্রকৃতপক্ষে সমাজের মধ্যে বসবাস করেই চুক্তির ধারণা লাভ করা যায়, সমাজের বাইরে থেকে নয়। সমাজ গঠনের আগে সামাজিক চুক্তির কল্পনা করলে আগের বিষয়কে পরে ও পরের বিষয়কে আগে রাখার দোষ - যেমন ঘোড়ার আগে গাড়ি রাখার দোষ(histeron proteron) হয়।

৩) প্রাক্ সমাজ প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে হব্স, লক ও রুশো সহমত পোষণ করেননি, ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হব্সের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল হিংস্র নেকড়ে বাঘের মতো, তার স্বভাবে ছিল লোভ, স্বার্থপরতা; লকের মতে, এই অবস্থায় মানুষের জীবনে ছিল অবাধ স্বাধীনতা ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্য; রুশো আবার প্রকৃতিক অবস্থায় বনচর মানুষের স্বাধীন ও শান্ত জীবনকে 'মর্তভূমিতে স্বর্গরাজ্যতুল্য' বলেছেন। চুক্তি মতবাদের তিনজন সমর্থকের তিনরকম অভিমত এটাই নির্দেশ করে যে, প্রকৃতিক অবস্থার চিত্রটি নেহাৎই কাল্পনিক।

৪) যদি তর্কের খাতিরে একথা মেনে নেওয়া হয় যে, ‘প্রাকৃতিক অবস্থায়’ চুক্তির ফলে সমাজের উৎপত্তি হয়েছে, তাহলেও প্রশ্ন হল - বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেসকল মানুষ এই চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেছিল, তারাই কেবল সেই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে, উত্তর-পুরুষরা এই চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে না। এমন ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে মানুষের পক্ষে চুক্তিবিরোধী ক্রিয়া-কলাপে লিপ্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। স্পষ্টতই সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সমাজ-বিরোধিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতাকে উৎসাহিত করে।

৫) ‘প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের আদিম পূর্বপুরুষ সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে, স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে’ - একথা স্বীকার করলে মানতে হয় যে, প্রাক্ সমাজ অবস্থায় মানুষ প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন ও আত্ম-সচেতন ছিল। কিন্তু সামাজিক পরিবেশে বর্ধিত হয়েই মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হয় ও আত্মচেতনার বিকাশ হতে পারে - আর এটিই হল ডারউইন (Darwin) অনুসারী আধুনিক বিবর্তন সম্মত মতবাদ।

৬) রুশোর কথিত ‘সাধারণ ইচছা’র (General will) ধারণাটি ও সুস্পষ্ট নয়। রুশোর মতানুসারে ‘সাধারণ ইচ্ছাই’ হল সমাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি এবং ‘সাধারণ ইচ্ছায়’ ব্যক্তি ইচ্ছা প্রতিফলিত হওয়ায় রাষ্ট্র যদি সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলেই ব্যক্তির ইচ্ছা সাধিত হতে পারে। রুশোর এমন অভিমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা এখানে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির যে ভেদ তাকে অগ্রাহ্য করা হয়। সাধারণ বা সমষ্টিগত ইচ্ছায় ব্যক্তির কিছু ইচ্ছা বা চাহিদা প্রতিফলিত হলেও সব ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় না। এমন ক্ষেত্রে ‘সাধারণ ইচ্ছা’র দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হলে সাধারণ মানুষের বিশেষ বিশেষ ইচ্ছা ও চাহিদার পরিতৃপ্তি হতে পারে না।

তবে চুক্তি মতবাদটির ওপরোক্তভাবে সমালোচনা করা হলেও মতবাদটিতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, ব্যক্তি-স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়েছে তাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। 'মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের বাইরে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না' - একথা অস্বীকার করেও মানতে হয় যে, সমাজস্থ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে, স্বাধীন মতামতকে গুরুত্ব না দিলে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থাই সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

জৈব মতাবাদ বা আঙ্গিক মতবাদ (The Organic or Organismic theory) ঃ

এই মতবাদে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদে ব্যক্তির ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ফলে দুটি মতবাদ একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের সমর্থক চুক্তিবাদীদের মতে সমাজ বা রাষ্ট্র হল ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুরক্ষা ও জীবনের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি যান্ত্রিক ও কৃত্রিম সংগঠন।

কিন্তু জৈব মতবাদের সমর্থকদের মতে, সমাজ বা রাষ্ট্র মনুষ্যসৃষ্ট কোনো কৃত্রিম সংগঠন নয় - সমাজ-বহির্ভূতভাবে মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই, থাকা সম্ভবও নয়। সমাজের মধ্যেই মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সমাজেরই সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজ নির্ভর। বস্তুত সামাজিক চুক্তি মতবাদ যেমন ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ, আঙ্গিক মতবাদও তেমনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। এদুটি বিরুদ্ধধর্মী মতবাদই চরমপন্থী মতবাদ এবং একদেশদর্শীদোষে দুষ্ট।

জৈব মতবাদ বা আঙ্গিক মতবাদ অনুসারে সমাজ এক জীবন্ত জীবদেহ, অতিকায় জীবদেহ - এবং জীবনের সাথে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, দেহ-কোষের যে সম্বন্ধ, সমাজের সঙ্গে সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তিবর্গেরও সেই সম্বন্ধ। সমাজের গঠনবিন্যাস ও কার্যাবলী জীবদেহের গঠনবিন্যাস ও কার্যাবলীর অনুরূপ। জীবদেহের সঙ্গে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, স্নায়ুতন্ত্র ও কোষের যে প্রকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গেরও সেই প্রকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবদেহের মতো সমাজও, বৃদ্ধি ও পূর্ণতা ও অবক্ষয়ের নিয়মে পরিচালিত হয়। কাজেই সমাজ এক জীবদেহ, অতিকায় জীবদেহ।

জীবদেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাদের নিজ নিজ কার্যাবলী আছে, সমাজেরও তদ্রূপ আছে। ব্যক্তিবর্গ সমাজের কোষ। জীবদেহ যেমন অসংখ্য কোষকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে, তাদের পুষ্টি সাধন করে, সমাজও তেমনি ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে তাদের জীবনকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। জীবদেহের খাদ্যগ্রহণ, পুষ্টি ও পরিপাকক্রিয়ার অনুরূপ ব্যবস্থা হল সমাজের যানবাহন ও সংবাদমাধ্যম, যথা - রেল, বাস, স্টীমার, এরোপ্লেন, সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি।

জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুরূপ ব্যবস্থা হল সমাজের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। জৈব মতবাদের সমর্থকরা আরও বলেন যে, জীবদেহের মতো সমাজেরও জন্ম আছে, যৌবন আছে, পূর্ণতাপ্রাপ্তি আছে, বার্ধক্য আছে এবং পরিণামে মৃত্যু আছে। আঙ্গিক মতবাদটিও সামাজিক চুক্তি মতবাদের মতো অতি প্রাচীন মতবাদ। সাম্প্রতিককালে এই মতবাদের সমর্থক হলেন, ব্লুনৎসলি(Bluntschli), স্পেঙলার (Spengler), কোঁৎ (Comte), নভিকো (Novicow) এবং বিবর্তনবাদী হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) প্রমুখ সমাজবিদ্গণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর Principles of Society গ্রন্থে আঙ্গিক মতবাদের সমর্থন প্রসঙ্গে জীবদেহের সঙ্গে সমাজের কয়েকটি মুখ্য সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলি নিম্নে আলোচনা করা গেল।

১) জীবদেহের মতো সমাজেরও ক্রম-বিকাশ বা বিবর্তন (evolution) হয় অর্থাৎ সমাজ ক্রমশঃই পরিণত হয়। ২) উভয়ক্ষেত্রেই এই ক্রম-পরিণতি সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থার প্রতি, সমসাত্ত্বিক অবস্থা থেকে বিষমসাত্ত্বিক অবস্থার প্রতি ধাবিত হয়। ৩) ক্রমবিকাশের সঙ্গ সঙ্গে বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গের মধ্যে কর্মভেদ(ক্রিয়া-বৈষম্য) প্রকাশ পায়। জীবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া - যেমন, চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সমাজের ক্ষেত্রেও তেমনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্ধারিত হয়, ৪) উভয়ক্ষেত্রে অংশগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়ার ওপর সমগ্রের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। ৫) উভয়ক্ষেত্রেই, সব কয়টি অংশ বা অঙ্গ বিনষ্ট না হলেও সমগ্র বিনষ্ট হতে পারে, আবার কোন একটি বা কয়েকটি অংশ বিনষ্ট হলেও সমগ্র থাকতে পারে।

উক্ত সাদৃশ্যগুলি ছাড়াও স্পেন্সার সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে ক্রিয়াগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন। স্পেন্সার জীবদেহের তিনটি প্রধান ক্রিয়াগত ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। যথা সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Sustaining System), বন্টন ব্যবস্থা (Distributing System) এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Regulating System)। আহার্য বস্তু দেহে রক্তসঞ্চার করে জীবকে সংরক্ষণ করে। সঞ্চিত রক্ত রক্ত-নালীর মধ্য দিয়ে সর্বত্র বাহিত বা বন্টিত হয়ে সমগ্র দেহের পুষ্টি সাধন করে। সর্বোপরি, মস্তিষ্ক স্নায়ু সমগ্র দেহকে, দেহের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্পেন্সারের মতে, সমাজদেহেরও অনুরূপ তিনটি কর্ম-ব্যবস্থা আছে।

যথা - কৃষি ও শিল্প হচ্ছে সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পরিবহন বন্টন ব্যবস্থা, আর সামরিকশক্তি ও প্রশাসন সমাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। তবে এভাবে সমাজকে জীবদেহের অনুরূপ বললেও স্পেন্সার এই অনুরূপতাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে রূপক অর্থে (Metaphor) প্রয়োগ করেছেন। স্পেন্সার সমাজকে জীবদেহের 'অনুরূপ' বলেছেন, জীবদেহের সঙ্গে অভিন্ন বলেন নি। কিন্তু অনেকে যেমন, ব্লুনৎসলি, সমাজ ও জীবদেহকে অভিন্ন বলেছেন। তাঁর মতে সমাজ এক অতিকায় জীবদেহ, যার প্রাণ আছে এবং যার জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, আবার মৃত্যুও হয়। এমনকি ব্লুনৎসলি সমাজের লিঙ্গভেদেরও উল্লেখ করে বলেন, রাষ্ট্র হল শক্তিবান পুরুষ, আর ধর্মীয় সংস্থা হল করুণাময়ী নারী।

সমালোচনা ঃ আঙ্গিক মতবাদের সমর্থকরা যদি 'আঙ্গিক সম্পর্ক'-এর মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির 'নিবিড় সম্পর্ক'কে তুলে ধরতে চান, তাহলে এই মতবাদ গ্রহণ করলে কোন দোষ হয় না। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। সমাজের মধ্যে বসবাস করে মানুষ নিজেকে 'মানুষ'রূপে চিহ্নিত করতে পারে। 'মানুষের সমগ্র নৈতিক জীবন, তার জীবনের উদ্দেশ্য সমাজের মধ্যে থেকে চরিতার্থ হতে পারে'। এই অর্থে সমাজকে 'জীবদেহের অনুরূপ' বলা যেতে পারে। 'জীবদেহের কোষের সঙ্গে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সমগ্র দেহের যেমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে তেমনি সমাজের ঘনিষ্ট সম্পর্ক এমন কথা বলার মধ্যে কোন দোষ নেই।

কিন্তু আঙ্গিক মতবাদের সমর্থকেরা যদি সমাজকে জীবদেহের ‘অনুরূপ’ না বলে ‘জীবদেহই’ বলেন তাহলে তাঁদের সেই মতবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সমাজ জীবদেহের মতো, কিন্তু জীবদেহ নয়। সমাজ জীবদেহের মতো, কেননা তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সমাজ জীবদেহ নয়, কারণ তাদের মধ্যে কিছু মৌলিক বৈশাদৃশ্যও আছে। এই বৈশাদৃশ্য বা পার্থক্যগুলি নিম্নে একে একে আলোচনা করা গেল।

১)সমাজের অর্ন্তগত ব্যক্তির সঙ্গে জীবদেহের অর্ন্তগত কোষের মৌলিক পার্থক্য আছে। দেহ কোষের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, দেহ থেকে বিচ্যুত হলেই কোষের মৃত্যু হয়। কিন্তু সমাজের অর্ন্তগত ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং সমাজচ্যুত হলেও তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব।

২) দেহের চেতনা থাকলেও দেহ কোষের স্বতন্ত্র কোন চেতনা নেই এবং দেহের চেতনা মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত থাকে। অপরপক্ষে, ব্যক্তি চেতনা আছে, অনুভূতি আছে এবং ব্যক্তি চেতনার অতিরিক্ত ভাবে সমাজের কেন্দ্রীভূত কোন চেতনা নেই।

৩) কোন একটি দেহকোষ একসঙ্গে দুটি দেহে অবস্থান করতে পারে না। কিন্তু একই ব্যক্তি এককালে একাধিক সমাজের, সামাজিক সংগঠনের সভ্যরূপে থাকতে পারে।

৪) জীবদেহের জন্ম ও মৃত্যু আছে কিন্তু সমাজের উৎপত্তি(জন্ম) স্বীকার করা গেলেও মৃত্যু স্বীকার করা যায় না - কেননা কোন এক সমাজের পতনের মধ্য দিয়ে অন্য কোন সমাজের আবির্ভাব হয়। কাজেই সমাজের রূপান্তর হয়, কিন্তু মৃত্যু হয় না।

৫) আঙ্গিক মতবাদের সমর্থক হার্বার্ট স্পেন্সারও জীবদেহের সঙ্গে সমাজের পার্থক্যের উল্লেখ করে বলেছেন যে, জীবদেহ মূর্ত, কিন্তু সমাজ বিমূর্ত।

৬) এই মতবাদের সমর্থকরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিলোপ ঘটিয়ে সমাজের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ব্যক্তিকে দেহ-কোষের তুল্য বললে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র অস্বীকৃত হয় এবং সেক্ষেত্রে সমাজের একনিষ্ঠ অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়, কারণ ব্যক্তির একমাত্র কাজ হয় সমাজের নির্দেশ অনুসরণ করে সমাজের পুষ্টি সাধন।

এমন মতবাদ হিটলারের স্বৈরাচারী নাৎসীবাদ (Nazism) অথবা মুসোলিনীর স্বৈরাচারী ফ্যাসীবাদ (Fascism) কে প্রশ্রয় দেয়, যেখানে সমাজের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে। এ এক চরম ও বিপজ্জনক মতবাদ। প্রকৃতপক্ষে, 'ব্যক্তির স্বাতন্ত্র স্বীকৃত না হলে সমাজের তেমন কোন অর্থই থাকে না'। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ তাই বলেন, আঙ্গিক মতবাদের আলঙ্কারিক বা রূপক মূল্য যাই থাক না কেন, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই মতবাদ মূল্যহীন। সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে, 'সমাজ এক অতিকায় জীবদেহ' এমন বলার পরিবর্তে বলতে হবে, 'সমাজ হল অনেক জীবকে নিয়ে এক জীব-সদৃশ-বিশেষ। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক যেখানে উভয়ই সমান মূল্যবান।

ভাববাদসম্মত মতবাদ (Idealistic Theory) ঃ

ভাববাদীদের মতে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, আঙ্গিকও নয়, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক হল আত্মিক বা আধ্যাত্মিক। ব্যক্তির যেমন চেতনা আছে, সমাজের বা রাষ্ট্রেরও তেমনি চেতনা আছে, অর্থাৎ সমাজের অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তি-ভিন্নভাবে সমাজের স্বতন্ত্র সত্তা এবং ব্যক্তি মনের অতিরিক্তভাবে গোষ্ঠী-মন বা সমাজ-মন আছে। প্রচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে এ প্রকার গোষ্ঠী-মন বা সমাজ-মনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ভাববাদী দার্শনিক হেগেল (Hegel), ব্র্যাডলি (Bradley), বোসাঙ্কে (Bosanquet) প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিকগণ এ প্রকার গোষ্ঠী-মন বা সমাজ-মনের উল্লেখ করে বলেন, সমাজে বসবাস করে সমাজস্থ সকল ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হল সমাজ-মনের নির্দেশকে মান্য করা।

এ সকল ভাববাদীদের মতে, সমাজের বা সমাজের সংস্থারূপে রাষ্ট্রের অর্ন্তগত ব্যক্তি নাগরিকদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছাগুলির যোগফলের অতিরিক্ত এক সমষ্টিগত ইচ্ছাকে (General Will) সমাজ বা রাষ্ট্র সৃষ্টি করে, যার নাম সমাজ-চেতনা, তেমনি ব্যক্তি-নাগরিকদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বসমূহের অতিরিক্ত এক সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হয়, যার নাম সমাজ-ব্যক্তিত্ব বা রাষ্ট্র-ব্যক্তিত্ব। এই সমষ্টিগত ইচ্ছা বা রাষ্ট্রীয় চেতনা, ভাববাদীদের মতে, অনিবার্যভাবে সর্বথা যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ হয়, ব্যক্তির একক ইচ্ছার পক্ষে যা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় ইচ্ছাই, সঠিক অর্থে, জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে সমর্থ এবং সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি-নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য হল, নির্দ্বিধায় রাষ্ট্রীয় আদেশ পালন করা।

আধুনিক ভাববাদবাদের জনকরূপে খ্যাত হেগেলের মতবাদেই সমাজ বা রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। হেগেলের ভাববাদসম্মত রাষ্ট্রীয় অভিমত হল - সমগ্র জগৎ ব্যবস্থার মতো রাষ্ট্র ব্যবস্থাও এক পরম সৎ(Absolute) পরম-চিন্তারই (Absolute Thought) বহিঃপ্রকাশ, হেগেলের ভাষায় 'The State is the Divine Idea on Earth'। হেগেল আরো বলেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাও পরমসৎ চিন্ময় সত্তার খণ্ডিত প্রকাশ এবং রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থান্ধ ইচ্ছার সমন্বয়ে এক স্বার্থশূন্য সাধারণ ইচ্ছার (General Will) উদ্ভব ঘটায়। রাষ্ট্রের ঐ সাধারণ ইচ্ছাকে মানুষ মাত্রই অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে।

হেগেলের মতে, জগতের পরমতত্ত্ব জড় নয়, তা হল এক চিন্ময় সত্তা (Spiritual)। হেগেল এই পরমসত্তাকে কখনো বলেছেন 'পরমচৈতন্য' (Absolute Thought/ Consciousness), আবার কখনো বলেছেন 'পরমাত্মা' (Absolute Mind)। এই পরমতত্ত্বই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে (বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদের) জড়জগতের মধ্য দিয়ে, জীবজগতর মধ্য দিয়ে এবং সর্বোপরি মানব-সমাজের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। সমাজ-চেতনা ঐ পরমতত্ত্ব পরমচৈতন্যেরই খণ্ড প্রকাশ, সমাজ-মন পরমাত্মারই খণ্ডিত অভিব্যক্তি। সমাজ, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান, তাদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, প্রশাসন, আইন-কানুন ইত্যাদি সবই এক পরমচৈতন্যেরই অভিব্যক্তিমাত্র।

সমাজের অর্ন্তগত মানুষের তাই অভীষ্ট হল, সমাজের মধ্য দিয়ে ঐ পরমচৈতন্যের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি সমাজের বাইরে থেকে সম্ভব হতে পারে না। সমাজের মতো মনুষ্যচিন্তাও যে একই পরমচৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ তা কেবল সমাজের মধ্যে থেকেই উপলব্ধি করা সম্ভব। ব্যক্তির এই উপলব্ধিকেই হেগেল 'পূর্ণতাপ্রাপ্তি' (perfection) বা 'আত্মোপলব্ধি' (Self-realisation) বলেছেন। সমাজসম্মত পথে সমাজের হিতসাধনের মধ্যে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি নিহিত। হেগেলের মতে, সমাজ হল এই জগতের ভগবৎশক্তির বা ভগবৎইচ্ছার অর্থাৎ পরমতত্ত্ব বা পরমাত্মার পূর্ণ প্রকাশ এবং নৈতিক আদর্শের এক মূর্তরূপ। এজন্যই সমাজ হল ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষলাভের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। ব্যক্তির আত্মচেতনা ও সমাজচেতনা যে একই পরমচৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ - এমন উপলব্ধির মধ্যেই ব্যক্তির 'পূর্ণতা' (perfection) নিহিত। এমন উপলব্ধি হলে, সমাজের অর্ন্তগত মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ অপনীত হয়, সমাজের সঙ্গে এক আত্মিক যোগ উপলব্ধ হয় এবং মানুষে মানুষে বিরোধ, স্বার্থসংঘাত ক্রমশঃই দূরীভূত হলে তারা প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।

হেগেলের মতে তাই সমাজ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে, অর্থচিন্তা পরিত্যাগ করে এবং সামাজের স্বার্থে, পরার্থে আত্মনিয়োগ করে ব্যক্তিকে আত্মোপলব্ধি করতে হয়। ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনা যদি একই পরম চেতনার অভিব্যক্তি হয়, তাহলে ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার কোন বিরোধ থাকতে পারে না। সমাজের নিয়মাবলী একই পরমচেতনা থেকে নির্গত হওয়ায় ব্যক্তির কাছে ঐসব নিয়ম বহিরাগত বা আরোপিত নয় এবং সেজন্য ব্যক্তির উচিত ঐসব নিয়ম মান্য করে চলা। সহজ কথায় হেগেলের মতে, সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। সমাজকল্যাণই ব্যক্তির কল্যাণ। পরার্থে জীবন সমর্পিত হলে নিজস্বার্থও সিদ্ধ হয়। সমগ্রের মধ্যে অংশ সত্য। সমগ্রের পুষ্টিসাধন হলে অংশও পুষ্ট হয়।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে, হেগেল তাঁর উপরোক্ত অভিমত একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবহ নৈতিক অনুজ্ঞা-বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন - 'ব্যক্তিত্বের সাধন কর' (Be a person) মানুষের মধ্যে আছে যেমন পশু-প্রবৃত্তিজনিত স্বাতন্ত্র্যবোধ(individuality), তেমনি আছে বিচারশক্তিজনিত ব্যক্তিত্ববোধ(personality) স্বাতন্ত্রবোধে মানুষ সমাজ-বিচ্ছিন্ন, আত্মমগ্ন, স্বার্থপর, একাকী ও নিঃসঙ্গরূপে কেবল 'ছোট আমি'র (lower self) সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা।

ব্যক্তিত্ববোধে মানুষ তার সংকীর্ণ গন্ডীকে অতিক্রম করে ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ পরিত্যাগ করে সমাজের হিতে নিজেকে নিয়োজিত করে। সমাজের মধ্যে পরমচৈতন্যের অভিব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে হলে তাই স্বতন্ত্র্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিত্ববোধকে জাগ্রত করতে হয়। মানুষের আসল পরিচয় তার ব্যক্তিত্ববোধে, স্বাতন্ত্র্যবোধে নয়।; সাযুজ্যবোধে, বিচ্ছিন্নতাবোধে নয়। আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য তাই ব্যক্তিত্বের সাধন প্রয়োজন। সমাজচেতনার কাছে ব্যক্তিচেতনাকে সমর্পণ করাই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সাধন।

হেগেলের অনুসরণ করে গ্রীণ্, ব্রাড্লি, বোসাঙ্কে প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকগণও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অনুরূপ আধ্যাত্মিক সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন।

সমালোচনা ঃ

সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কে ভাববাদীদের মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ,

১) ব্যক্তি ও মনের অতিরিক্তভাবে সমাজ মনের বা গোষ্ঠী-মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাববাদীদের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিমনের সমষ্টিরূপে 'সমষ্টিগতমন' বলে কিছু স্বীকার করা যায় না। কোন বনাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের সমষ্টিরূপে 'সমষ্টিগতবৃক্ষ' বলে যেমন বৃক্ষের কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিমনের সমষ্টিরূপে 'সমষ্টিমন' বা 'গোষ্ঠীমন' বলেও কোন মনের অস্তিত্ব নেই।

সমাজের চেতনায় ব্যক্তিমনের চেতনাই প্রতিফলিত হয়। সমাজ-চেতনা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের চেতনার প্রতিফলন, অতিরিক্ত কিছু নয়। ‘গোষ্ঠীমন’ বা ‘সমাজমন’কে রূপক হিসাবে গ্রহণ করা গেলেও সেই রূপকের বাইরে তার কোন মূল্য নেই। ‘সমাজমন’ বা ‘সাধারণ ইচ্ছা’ অধিবিদ্যক প্রত্যয়মাত্র, যার কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। বাস্তবিকপক্ষে, ব্যক্তিমনের উর্দ্ধে ‘সমাজ-মন’ অথবা ব্যক্তি-ইচ্ছার উর্দ্ধে ‘সাধারণ ইচ্ছার’ কোন অস্তিত্ব নেই।

২) জগতের মূলে কোন পরমতত্ত্বকে স্বীকার করা গেলেও সেই পরমতত্ত্ব যে চিৎশক্তি হবে - হেগের এই অভিমত সকলে গ্রহণ করেন না। জড়বাদী দার্শনিকগণ পরমতত্ত্বকে 'জড়শক্তি' বলেন। ভাববাদীদের মধ্যেও আবার পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ আছে।

৩) ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধকে গুরুত্ব না দিয়ে এবং সমাজকে দেবত্ব আরোপ করে হেগেল ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের মধ্যে সমাজের জন্যই ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য সমাজ নয়। সমাজসেবাই দেব সেবা। এভাবে সমাজকে দেবত্ব অর্পণ করে, সমাজচেতনাকে ব্যক্তিচেতনার উর্দ্ধে স্থাপন করে হেগেল ব্যক্তিকে সমাজের কৃতদাসে এবং সমাজকে স্বেচ্ছাচারী একনায়কে পরিণত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে আঙ্গিক মতবাদের দোষ থেকে ভাববাদীদের মতবাদ মুক্ত হতে পারে না। ব্যক্তির যদি কোন স্বাতন্ত্র্য না থাকে, ব্যক্তিকে যদি সর্বতোভাবে সমাজের নির্দেশ মান্য করতে হয়, তাহলে ব্যক্তিকে এক সর্বগ্রাসী সমাজের মুখগহ্বরে সমর্পণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, হেগেলের মতবাদে স্বেচ্ছাচারী, দাম্ভিক গণতন্ত্রবিরোধী এবং কর্তৃত্ববাদী সমাজব্যবস্থাকেই আদর্শরূপে গণ্য করা হয়। এজন্য অনেক সমালোচক মনে করেন যে, হেগেলের এই প্রকার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে হিটলার জার্মানসমাজে স্বেচ্ছাচার নাৎসীদের এবং মুসলিনী রোম সমাজে স্বৈরাচারী ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে, জরুরী অবস্থায় বা আপৎকালে রাষ্ট্র কতকগুলি বিষয়ে তার নাগরিকদের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব আরোপ করতে পারে। যেমন, সরকারী কর্মস্থলে নির্ধারিত সময়ে হাজির হওয়া এবং নির্ধারিত সময় ধরে কর্ম করাকে বাধ্যতামূলক করতে পারে। রাষ্ট্র বিরোধী কোন কর্মে লিপ্ত এমন অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করতে পারে।, কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিরপরাধ ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জীবনহানি ঘটাতে পারে না। 'বেঁচে থাকার অধিকার' মানুষের বিবিধ অধিকারের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকার এবং এই অধিকার থেকে কোন রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের বঞ্চিত করতে পারে না।

কিন্তু দেখা যায় যে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের আদেশকে অমান্য করার বা প্রতিরোধ করার উপায় না থাকায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক নাগরিককে অপ্রতিরোধ্য রাষ্ট্রাদেশ পালনের জন্য যুদ্ধে যোগদান করে পরিণামে 'বেঁচে থাকার অধিকার' থেকে বঞ্চিত হতে হয়, যা নৈতিক দিক থেকে কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাববাদী মতবাদের সমর্থক গ্রীণও যুদ্ধকালীন এ প্রকার ব্যবস্থার বিরোধীতা করে বলেন, ব্যক্তির নানাবিধ অধিকারের মধ্যে 'বেঁচে থাকার অধিকার' হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকার এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের প্রশ্নাতীত আদেশ ও ক্ষমতা এই অধিকারের পক্ষে একান্ত বিপজ্জনক। তাহলে ভাববাদীরাও বলেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবে আপেক্ষিক, কখনই চূড়ান্ত নয়। হেগেলের ভাববাদসম্মত মতবাদের অপব্যাখ্যার ফলেই চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রীয় মতবাদের উদ্ভব হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ